15) গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রম চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কৃতিত্ব আলোচনা করো।

◉ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও বিক্রমাদিত্য কি একই ব্যক্তি?

→ ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সমুদ্রগুপ্তের পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সম্ভবত তিনি ৩৮০-৪১৫ খ্রিস্টাব্দ এই সময়কাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। গুপ্ত লিপি থেকে জানা যায় দত্তা দেবীর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তেরই পরেই সিংহাসনে বসেন আবার বিশাখদত্তের দেবী চন্দ্রগুপ্তম চন্দ্রগুপ্তের জ্ঞাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। রামগুপ্ত জনৈক শক রাজার কাছে পরাজিত হয়ে কলঙ্কজনিত শর্তে সন্ধি করেন এবং নিজ পত্নী ধ্রুবদেবীকে শক রাজার হাতে অর্পন করেন। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চন্দ্রগুপ্ত শকরাজকে পরাজিত ও নিহত করে ধ্রুবদেবীকে মুক্ত করেন। এরপর রামগুপ্তকে হত্যা করে সিংহাসন দখল নিয়ে ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করেন। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন বীর যোদ্ধা ও সুশাসক এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই বিশাল সাম্রাজ্যকে রক্ষণা-বেক্ষণ ও সুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে পরবর্তী উত্তরাধিকারদের জন্য রেখে যান, যা তাঁর সামরিক প্রতিভা প্রশাসনিক দক্ষতা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত দুটি পন্থা অবলম্বন করেন। একটি হল বৈবাহিক সূত্র অপরটি হল যুদ্ধযাত্রা। তিনি নাগ বংশীয় রাজকন্যা কুবের নাগাকে বিবাহ করেন এবং কুবের নাগার গর্ভজাত সন্তান প্রভাবতীকে তিনি বাকাটক রাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সাথে বিবাহ দেন। কর্ণাটক দেশের কাদম্ব বংশের কাকুৎস বর্মনের কন্যাকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাথে বিবাহ দেন বলে কদম্ব লিপি থেকে জানা যায়। পশ্চিম ভারতে শক শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করতে নাগশক্তি ও দাক্ষিণাত্যের বাকাটক শক্তির সমর্থন ছাড়া সফলতা লাভ করা সম্ভবপর ছিল না, তাই তিনি এই বৈবাহিক নীতি নেন।

—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সামরিক কৃতিত্ব হল মালব, গুজরাট এবং কাথিয়াবাড় অঞ্চল থেকে শকদের বিতাড়ন। তিনি যে শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমকালীন লেখ থেকে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সন্ধিবিগ্রহিক বীরসেনের উদয়গিরি লিপি থেকে জানা যায় বীরসেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে উদয়গিরিতে যান যখন তাঁর প্রভু পৃথিবী জয়ের চেষ্টায় রত ছিলেন। সাধারণত মনে করা হয় এই যুদ্ধ জয় ছিল শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এখানে তিনি শকদের পরাজিত করে শকারি উপাধি নেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৩৮৮–৪৭ খ্রিঃ মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে শকদের অনুকরণে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করেছিলেন এবং গুপ্ত বংশের চিরাচরিত ময়ূর প্রতীকের পরিবর্তে শকদের অনুকরণে মুদ্রায় চৈত্য, অর্ধচন্দ্র চিহ্ন খোদাই করেছিলেন। এই সাফল্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কাথিয়াবাড় ও গুজরাট তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এরফলে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের অধিকাংশ গুপ্তদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

উত্তর-পশ্চিমে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। দিল্লীর কুতুব মিনারের কাছে মেহরৌলি গ্রামে একটি লোহা স্তম্ভে চন্দ্র নামধারী একটি রাজার লিপি খোদাই দেখা যায়, এই লিপিতে কোনো সন, তারিখের উল্লেখ নেই। এই লিপিতে চন্দ্র রাজা কর্তৃক বঙ্গদেশ এবং ব্যাকট্রিয়ানদের বিরুদ্ধে সাফল্যের কথা উল্লিখিত আছে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে এই লিপিতে রাজা চন্দ্র হলেন গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কারণ অন্য কোনো রাজা একদিকে বঙ্গদেশ অন্যদিকে সিন্ধু অভিযান করতে সক্ষম ছিলেন না। যদিও এই মতবাদ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।

রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পাশাপাশি যেই সময়ে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যে অপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল তার কৃতিত্ব দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রাপ্য। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে গুপ্ত রেনেসাঁসের সূচনা হয়। সম্ভবত মহাকবি কালিদাস তাঁর সমকালীন ছিলেন। কিংবদন্তি নবরত্নের কয়েকজন পন্ডিত তার রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েনের বিবরণ থেকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে বলা যায় রাজনৈতিক মহাত্ম্য, সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ও অর্থনৈতিক সচলতা পূর্ণ-তার মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত শাসনকে অমর করে তুলেছিলেন।

গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পাশাপাশি সংস্কৃতির যে অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল তা তার প্রাপ্য। সম্ভবত অমর কবি কালিদাস তার সমসাময়িক। কিংবদন্তির নবরত্নের কয়েকজন রত্ন তার রাজসভায় ছিলেন। ফা হিয়েনের বিবরণ থেকেও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়। তার আমলে গুপ্ত রেনেসাঁস বা বিখ্যাত গুপ্ত সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার-এর মতে গুপ্ত সভ্যতা ছিল সমাজের উপরতলার লোকের জন্য। সাধারণ মানুষের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। অবশ্য এ জন্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে দায়ী করা যায় না। বিতর্কের প্রশ্ন এখানেই দানা বাঁধতে শুরু করে, কোনো কোনো মুদ্রায় দেখা যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-এর সাথে বিক্রমাঙ্ক ও বিক্রমাদিত্য উপাধি। সহজেই প্রশ্ন ওঠে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কিংবদন্তী বিক্রমাদিত্য কি একই ব্যক্তি ছিলেন? এ বিষয় নিয়ে ঐতি-হাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ লক্ষ্য করা যায়।

কিংবদন্তি বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে অভিন্ন ব্যক্তি তার উত্তর দিতে গিয়ে এই দুজনের মধ্যে যে সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তা একদল ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার ভিত্তিতে উভয়েই যে একই ব্যক্তি তা তারা বলতে চেয়েছেন। বিক্রমাদিত্য শকারি বা শক-নিধনকারী ছিলেন। উজ্জয়িনীকে কেন্দ্র করেই তার কীর্তিকাহিনী ও সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। কালিদাসসহ নবরত্নের উপস্থিতিতে তাঁর রাজ-সভা অলংকৃত হয়েছিল। এই তথ্যের সাথে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অনেক মিল

পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও শকদের পরাজিত করেছিলেন। তাঁর সময়ে উজ্জয়িনী দ্বিতীয় রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছিল তাছাড়া এই সময়ে কালিদাসের প্রতিপত্তি পাওয়া যায়। এছাড়াও নবরত্নের অনেকেই তাঁর রাজসভা অলংকৃত করে-ছিলেন।

বিক্রমাদিত্যের এই কাহিনীর সঙ্গে কিংবদন্তি বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মিলের সঙ্গে কিছু অমিলও লক্ষ্য করা যায় এবং এই মতের দুর্বলতাগুলি প্রকট হয়ে পড়ে। এই মতগুলি ছিল কিংবদন্তি ~~রাজধানী~~ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীর সেন উদয়গিরি লিপিতে ~~তাকে~~ নিজেকে পাটলিপুত্রের অধিবাসী বলেছেন। হিউয়েন সাং গুপ্ত যুগের কিছু সময় পরে ভারতে আসলে দেখেন পাটলিপুত্র জঙ্গল ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। নবরত্নের সকল রত্ন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় জীবিত ছিলেন না। মাত্র কয়েকজনকে পাওয়া যায়, নবরত্নের অন্যতম রত্ন বরাহমিহির তাঁর সমসাময়িক ছিলেন না। বিক্রমাদিত্য বিক্রম সম্বত প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এমন কোনো সম্বত প্রবর্তন করেননি।

এইসব কারণে আধুনিক ঐতিহাসিকরা অভিমত দিয়েছেন যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কিংবদন্তি বিক্রমাদিত্য একই ব্যক্তি নন। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন বিক্রম সম্বত ও রাজা বিক্রমাদিত্যের বিষয় ভারত ইতিহাসে এক অমীমাংসিত বিষয়।